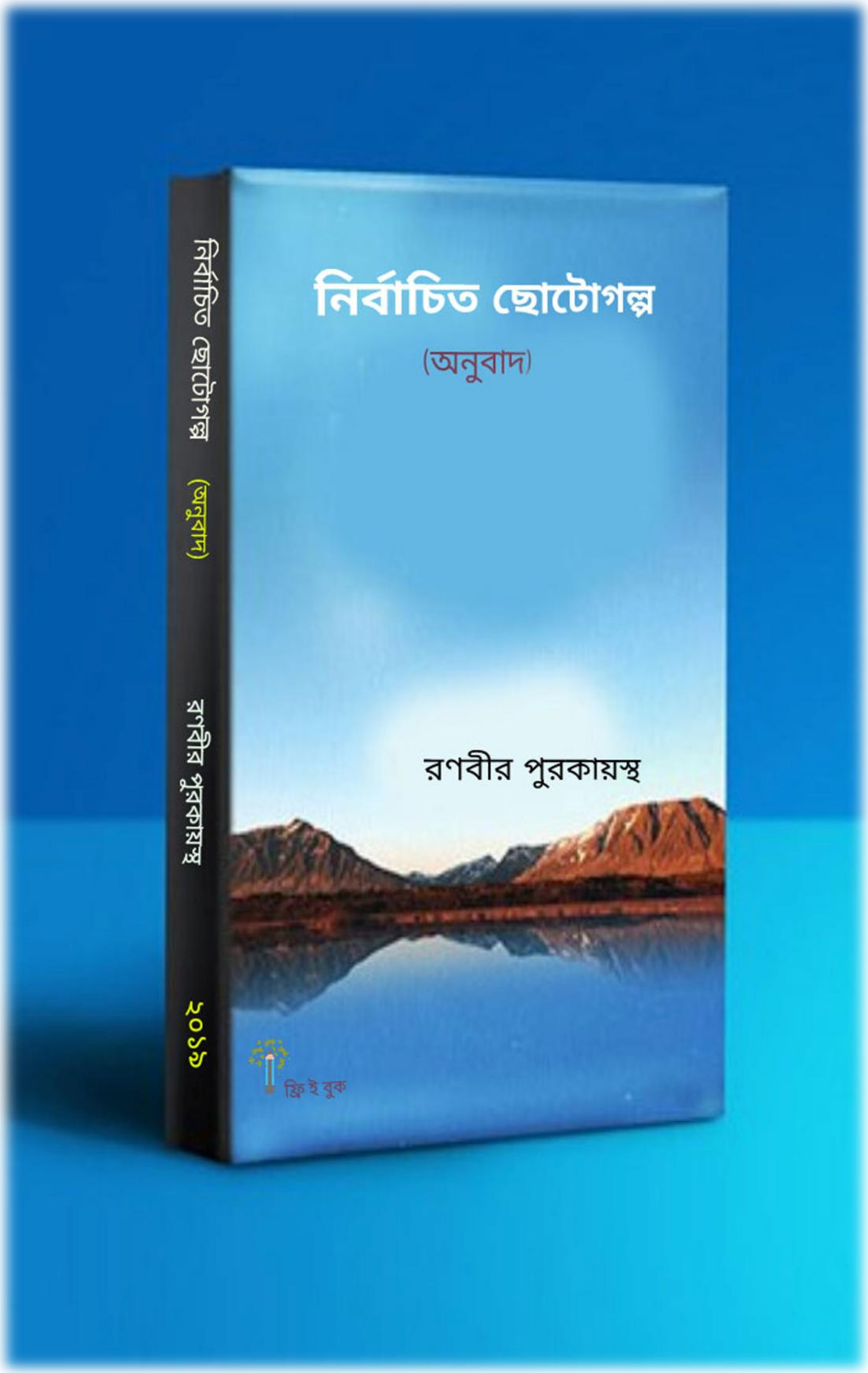
নির্বাচিত ছোটোগল্প
(অনুবাদ)
রণবীর পুরকায়স্থ
ফ্রি ই বুক
নির্বাচিত ছোটোগল্প (অনুবাদ) রণবীর পুরকায়স্থ ২০১৬

নির্বাচিত ছোটোগল্প সংকলন (অনুবাদ) ২০১৯

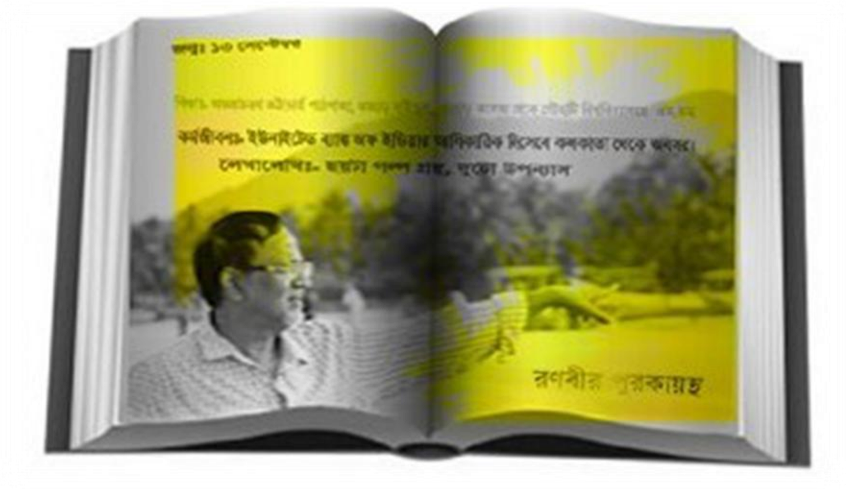

সূচিপত্র

- জল কন্যা - লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
- দৈবকীর দিন- অরুপা পটঙ্গিয়া কলিতা
- লখেতরা - রবীন শর্মা
- সোনার দাঁত রূপোর দাঁত - বিপুল খাটনিয়ার

জলকন্যা

জলকন্যা

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

ছোট নদী রূপহী। শীতের রুখু সময়ে কুলুকুলু বয়ে যায়।সঠিক অর্থে জলতরঙ্গে বয়ে যাওয়া স্ফটিকখণ্ড বলেই মনে হয়। আবার বর্ষায় ঘোলাজলে হয়ে যায় কাদামাখা। আশ্বিন কার্তিকের রূপহী শান্ত, ক্ষীণ আর লাজুকলতা যেন। আষাঢ় শ্রাবণে রূপহী বেশ পুরুষ্ঠ, অস্থির আর নৃত্যপরা, দেখলে মনে হয় সংহারক ।

রূপহী পারে পরিত্যক্ত ভূমিতে মস্ত বড় এক ডুমুর গাছ। গাছের নীচে একটি মেয়েকে সকাল সন্ধ্যা প্রায় সবসময় বসে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির চোখদুটি সর্বক্ষণ রূপহীর বুকের ঘূর্ণিজলের উপর নিবিষ্ট থাকে। সেই উপরিভাগকে জলঘূর্ণি না বলে রূপহীর মুখ বললে কথাটি সুপ্রযুক্ত হয়। কাঠ কুটো নল খাগড়া যা যেখানে পায় রূপহী হা করে পেটের ভিতর সব ঢুকিয়ে নেয়। বালিকাটির প্রাত্যহিক কাজ হল, খাগের মুঠো জড়ো করে এক এক টুকরো নদীর উপর ছুঁড়ে দেওয়া আর কেমন করে প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত তাঁতের মাকুর মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা হয়ে ভুস করে তলিয়ে যায়, সেই দৃশ্য দেখা। অন্য একটা কাজও আছে তার, রূপহীর সঙ্গে কথা বলে যাওয়া, মাঝে মধ্যে আদি অন্তহীন গান সাজিয়ে রূপহীকে গেয়ে শোনানো। তার একটা গানের পরিচয় এরকম,

‘তুমিও রূপহী আমিও রূপসী
রঙের উপর রূপের সারি
খাগের পাতায় নৌকো বেয়ে ভাসি
মাঝ নদীতে ডুবে আমার তরী।’

ষোল বছরের কিশোরীটি যে কী করে এসব ছেলেমানুষীতে সময় কাটায় তা ভগবানই জানে আর জানে সে নিজে।

তার সঙ্গে সময়েরও কোন মিল নেই। গাছের নীচে বসে বসে ওর সময় কাটানোয় সময়েরও ঘোর আপত্তি। সংসারে সময় তুরঙ্গমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে সে মানুষকে পিছনে ফেলে চলে যায়। কালক্রমে মেয়েটির কাছে একসময় বর আর বিয়ে এসে উপস্থিত হয়। ছেলেটি

বাইশ বছরের, দেখতে বেশ, শুনতে ভাল, কুলেও ভাল। মেয়েটির মায়েরও মত, বাপেরও মত , তাই নির্বিরোধে বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। ছেলে মেয়ের দেখা হয়, পরিচয়ও হয়। বিয়ের বাকি সাতদিন। কিন্তু মেয়েটির মনের টান হবু বরের থেকে যে রূপহী নদীর দিকেই বেশি। এদিকে বিয়েও এগিয়ে আসছে কিন্তু ওর কোনো হেলদোল নেই। এখনও আগের মতো রূপহীর পারে তার সময় কাটে। ওর এমন স্বভাব দেখে ছেলেটি যার পর নাই বিরক্ত হয়।

এক সন্ধ্যায় সে নদীর পার থেকে ফিরে এসে শোনে হবু বর ওকে বিয়ে না করেই কাল বিদেশ চলে যেতে চাইছে। কথাটি কাঁঠালের ভুতির ভিতর বাঁশের শলা ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো ওর বুকে বিঁধে। সে ভাবে, 'যাই' আজ রাতেই তার হাতে পায়ে ধরে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। আবার ভাবে, 'লজ্জা শরম' এর মাথা খেয়ে আমার পক্ষে ওসব করা সম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে অনিদ্রায় তার রাত কাটে না। তখন বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বিছানা ছেড়ে সে একা একা রূপহীর পারে পৌঁছে যায়। নদীর পারে যেতেই তার চিন্তা চেতনা মুহূর্তে মধ্যেই রূপহীর স্রোতে কোথায় ভেসে চলে যায়। আবার সে খাগের গোছা এনে নদীর উপর একটুকরো একটুকরো করে ফেলতে থাকে। এমন সময় সহসা পিছন থেকে দুখানি উষ্ণ হাত তার চোখ দুটি চেপে ধরে। সে জোর করে হাত সরিয়ে ফিরে দেখে সেই হবু বর। এরপর দুজনের মধ্যে সেকি হাসির ধুম। রূপহীর ওপার থেকে প্রতিধ্বনিও সমান ভাবে হাসিতে যোগ দেয়। ডুমুর গাছের ওপরে দুটি প্যাঁচা পেঁচিও ছিল। ওরাও সেই আনন্দে চুপ করে থাকতে না পেরে নিম নিম ডেকে ওঠে। বাকি খাগের ডাল যা ছিল ওর হাতে সব একত্রিত করে মেয়েটি নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়ে তিনবার হাততালি দিয়ে ওঠে।

বর বলে, 'এসব কী করলে?'

কনেও হাসতে হাসতে বলে, 'এই জল ঘূর্ণিতে একটি মেয়ে এইমাত্র ডুবে মরল। আমি না ময়নাপাখি? আমাকে খাঁচায় সাজিয়ে রাখবে না, নিয়ে চল।'

*****

দৈবকীর দিন

দৈবকীর দিন

অসমীয়াঃ অরুপা পটঙ্গীয়া কলিতা

“নে বাবা নে, কুড়িটা টাকা দে আর নিয়ে যা। একটা মাছ নিয়ে আর কতক্ষণ পাহারায় থাকব ?” ডিমাল ঘনিয়া মাছটা বেত দিয়ে গেঁথে গছিয়ে দ্রুত তার ছোট দোকানটা বন্ধ করে দেয়। বাজারের ঐ মাথায় থাকা মনোদের দিকে উঁকি মেরে একবার দেখে, “এই মনো” কোন উত্তর নেই। তার মানে ওরা চলে গেছে। তাকেই শুধু অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত থাকতে হল। তা বলে এরকম মাছগুলিকে জলের দামে দেয় কী করে? কিছুদিন আগেও বেপারিরা তাদের উচিত দাম দিয়েছে। কিছুদিন থেকে কী হল কে জানে, দাম দেওয়ার সময় শরীরের মাংস কেটে দেওয়ার মতো করে। বলে ওদেরও নাকি মাঝখানে কাউকে বখরা দিতে হচ্ছে। দৈবকী মুখে একটা তাম্বুল পুরে নেয়, ‘মেখলাপরা কাশখাউরি বদ মানুষগুলোর বিনিপয়সায় মাছ চাই, শালা শকুনে খাওয়ার জাত।’ বড় বড় কথায় গালি দিয়ে দৈবকী একটু শান্ত হয় ।

বাজারের এখানে ওখানে লম্ফ আর মোমবাতি জ্বলছে। দৈবকীর পাশের দোকান, আলুপেঁয়াজের বেপারি রঘুবীর মন্দিরের মতো সাজানো আলুপেঁয়াজের স্তূপের উপর দুটো মোম জ্বালিয়ে দেয়। মোমবাতির দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে দৈবকীর দিকে তাকায়, ‘কী হল দৈবকী দিদি আজ যাবে না নাকি ?’ উরাতে থাপ্পড় মেরে দৈবকী রেগে ওঠে, ‘না গিয়ে তোর সোনা মুখ দেখব নাকি ?’ শাকসব্জির দোকানি যদুরাম সব্জিগুলি ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে । তার শহুরে খদ্দেরদের আসার সময় হয়েছে । রঘুবীর আর যদুর মাঝখানে মশলার দোকানদার গণেশ আজ আসে নি, এই ফাঁকে যদুরাম তার লেবুগুলোও রং আর আকৃতি অনুযায়ী সাজিয়ে দোকানের আয়তন বাড়িয়ে ফেলেছে । প্রতিদিন যদুরামের এই শাকসব্জী সাজানোর কাজটা ছেলেখেলা মনে হয় , তাকে খুঁচিয়ে একথা বলতে গিয়ে বলে, “গণেশের আবার কী হল রে ?” যদুরাম ঝিঙ্গের স্তূপটা ঠিক করে ফিশফিশিয়ে বলে, “সে আসবে কী করে ? সেতুর উপর বোমা মেরে মিলিটারি মারার পর গণেশদের গ্রামে আর কেউ থাকতে পারে না । গোটা গ্রামটাই মিলিটারি ঘিরে রেখেছে ।” ঘটনাটা দৈবকীও শুনেছে । হঠাৎ তার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে ।

বাজারের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে । দৈবকীর বুকটা কেমন করে ওঠে । তখন বেপারিটাকে মাছের চুবড়ি দিয়ে দিলে এতক্ষণে ভাত খেয়ে পাটিতে শুয়ে ঘুমোতে পারত । মনোরাও

বলছিল, সেই তো দুটো পয়সার লোভে বসে থাকে । আরো কিছু পয়সা জমলেই যে খুঁটাটি কেটে ফেলবে। শহরের হাসপাতাল থেকে শাশুড়ি বুড়ির ছানি কাটিয়ে আনলে একটা বড় চিন্তা থেকে মুক্তি তার। তার দেরি হওয়া দেখে বুড়ি নিশ্চয় এতক্ষণে হাতড়ে হাতড়ে রান্নার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। মেয়েটা একটু বড় হওয়ায় এখন ঠাকুমার এটা সেটা করে দিতে পারে। ভাতে একটা আলুসিদ্ধ থাকলে নুন তেল দিয়ে মেখে খাওয়া বুড়ি খুব পছন্দ করে। দৈবকী আলু আধাকেজি কেনে। এইটুকুনির সঞ্চয় ভেঙে কোথায় তাদের আলু কেনা হয় ? আজ কপাল ভাল বলেই। দুই কেজি চালও নেয়। ঘরে থাকার কথা তিন চার কেজির মতো। ছেলেটাও নিশ্চয় কয়েকটা মাছ ধরে রেখেছে। আলু, চালের ঠোঙা দুটো নিয়ে দৈবকী বাজার থেকে বেরয়। মেখলার কোমর থেকে টাকা কটা বের করে সে ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর হন হন করে হাঁটতে থাকে। বুড়ি নিশ্চয় বারবার বলছে বাচ্চাদের 'মা এল নাকি রে? কোথায় গিয়ে মরল আমাশার বেমারি বেটি।' ছেলেমেয়েগুলোও আজকাল বুড়িকে কী কম জ্বালাতন করে? অন্ধ বুড়ির জন্য দৈবকীর মনটা খলুই থেকে মাটিতে ফেলে দেওয়া কই মাছের মতো ধড়ফড় করে ওঠে।

শহরের রাস্তার লাইটগুলি অনেক আগে থেকেই জ্বলছে। দোকান পশার সব ঝলমল করছে। বাজারের কুপিলম্ফের টিমটিমে আলো থেকে এই চকমকে শহুরে আলো যেন দৈবকীকে উলঙ্গ করে দেয়। ব্লাউজটার নীচের দুটো বোতাম নেই, কোমরে গিঁট দিয়ে বাঁধা পেটিকোটহীন মেখলাটাও হাঁটুর নীচের পা দুটো ঢাকতে পারছে না। ছোট চাদরটাও বারবার বোতাম ছেঁড়া ব্লাউজটাকে খুলে দিচ্ছে। রাস্তার সব মানুষ যেন তার শরীরটার দিকেই তাকিয়ে আছে, কোন একটা তো তার দিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল। সে কাঁখের নীচে শক্ত করে ধরে রাখা চুবড়িটা আলু আর চালের ঠোঙা সহ মাথায় উঠিয়ে নেয়। চুবড়িটার নীচের আঁধারে লুকিয়ে সে মাথা নুইয়ে মেখলায় চপট্ চপট্ শব্দে তুলে দ্রুত এগিয়ে যায়।

সে লোকালয় পেরিয়ে শহরের দক্ষিণ দিকে নদীর পারের গ্রামে যাওয়ার কাঁচা পথ ধরে। মানুষ আলো সব কমে আসে। রাস্তার পাশে খেতের জমিগুলি সব অন্ধকারে নিমজ্জিত। মাঝে মাঝে দলবদ্ধ দাঁড়কিনা মাছের মতো থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। কোথাও কয়েকটা শিয়াল ডেকে ওঠে। যুবক রিক্সাওলাটা একা একা গান গেয়ে খটলং খটলং শব্দে শহরের দিকে চলে যায়। দৈবকী আকাশে মুখ তুলে তাকায়, ভরা বর্ষার ফুলে ওঠা নদীর মতো ভরে আছে অন্ধকার, কোথাও একটু আলো নেই। একটা গুমোট গরম পড়েছে, সে শরীর থেকে ব্লাউজটা খুলে ফেলে, ঘামে ভেজা ব্লাউজটা কোথাও ছর শব্দে ছিঁড়ে যায়। ব্লাউজটা চুবড়িতে ফেলে দিয়ে সে মেখলাটা বুকে উপর উঠিয়ে

নেয়। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা শীতল হয়। ব্লাউজের ভিতরে রাখা টাকা কটা সে মেখলার কোমরে ভরে নেয়।

এই পথে সাধারণত রাতে গাড়ি ঘোড়া একেবারেরই চলে না। আর একটু গেলেই নামঘর। গায়ে কাপড় নাথাকা বেলা থেকেই দৈবকী নামঘর দেখছে। নামঘরের এলাকাটি বেশ বড়, সামনে দুটো বিশাল পুকুর, গঙ্গা আর যমুনা। শীতগ্রীষ্মে পুকুর দুটোর জল শুকোয় না। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে এই পুকুরের জল বোতলে ভরে বেদীর উপর রাখে, নিয়ে যায়। নামঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল বটগাছ। বটবৃক্ষের ছায়া পড়ে গঙ্গা যমুনা সবুজ হয়ে থাকে। সবুজ জলে শেওলা ধরা দুটো কচ্ছপ থাকে, দৈবকী আর যশোদা। কিছু এক মুঠো ছুঁড়ে 'দৈবকী যশোদা আয়' বলে ডাকলেই কচ্ছপ দুটো সেতুর কাছে চলে আসে। সে এই কচ্ছপের কথা শুনেছে, দেখে নি। দেখবে কী করে, শরীরে মাছের গন্ধ নিয়ে জামকালো মানুষের যে নামঘরে প্রবেশ নিষেধ। তার নামটি কি সর্বদা-শোনা কচ্ছপের নামে রেখেছিল তার মা? ছোটবেলার দুষ্ট সঙ্গীগুলো তাই তাকে 'বড় পুকুরের কচ্ছপ' বলে খেপাত। নদীর তীক্ষ্ণ বাঁকের কাছে সেতুটা পেরোলেই জলে বাতাসের ঢেউ খেলে যাওয়া মাছের গন্ধে ভরপুর তাদের গ্রাম। ছোটবেলায় দিনে একবার হলেও দৈবকী নামঘরের দিকে আসত, ক্রীড়ারত বাচ্চাদের তখন দু একজন একটু মহাপ্রসাদ ছুঁড়ে দিত। মহাপ্রসাদের লোভ মুখ্য নয়, প্রধান হল কৌতূহল। আসতে যেতে সবাই মাথা নুইয়ে যাওয়া গাছ আর পুকুর ঘেরা ঘরটার ভিতর কী আছে? দৈবকী হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। নামঘর পেরিয়ে পুলটায় পা দিতে পারলে আর চিন্তা নেই। ঝগড়া-ঝাটি, মদ্যপের গর্জন, শিশুর কান্না, স্বামীর কিলচড় খেয়ে পত্নীর শাপশাপান্ত নিয়ে তাদের গ্রাম।

আঁধার আকাশে বিদ্যুতের সুতো একটা চমকে ওঠে। ক্ষণিকের আলোকে সে দেখে একটা কালো ও হলদে ছোপ ছোপ নাগরাজ সাপ ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তিনটে মিলিটারি গাড়ি গভীর অন্ধকার তাড়িয়ে দেয়। দৈবকী রাস্তার এককোণে দাঁড়ায়। সে ভাল করে দেখে মাঝখানের গাড়িটার পিছনের চাকা নাগরাজকে থেঁতলে দেয়। মেঘ ডাকে গুমগুম, ফিরে ফিরে বিদ্যুত চমকায়। বিদ্যুতের আলোয় থ্যাঁতলানো সাপটাকে দেখে দৈবকীর মনে শিঙি মাছের কাঁটা ফুটে। ভয়ডরহীন মানুষটাও এক অদ্ভুত ত্রাসে কেঁপে ওঠে। আজ মানুষটা বেঁচে থাকলে তাকে এমন দিন রাত্রির ভেদাভেদ হারা হতে হয় না। এক হপ্তার জ্বর পায়খানায় মরে যাওয়া যোয়ান মানুষটার কথা মনে পড়তেই তার গাল দিয়ে মাগুর মাছের গায়ে পিছলে পড়া জলের মতো গরম আঁখিজল বেরিয়ে আসে।

নামঘরের এলাকাটি মস্তবড়ো। একদিকে নামঘর অন্যদিকে ধানক্ষেত। দিনের বেলাও একটু জায়গা পার হতে দুর্বল মানুষের বুক ধড়ফড় করে। অন্য সময় দৈবকীরা যখন নামঘরের কাছে যায়, তখন মহিলারা নামঘরের বাইরে খোলা জায়গায় নামগান করে। এই নামঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। মহিলাদের সাজানো প্রদীপ শরাই নামঘরের তত্তাবধায়ক নামঘরিয়া মনিকূট এর ভিতর রেখে

আসে, মহিলারা নামঘরের সিঁড়িতেই প্রণাম করে। গরম কালে দৈবকীরা নামঘরের দেউড়ির সামনে বটগাছের নীচে হাত পা ছেড়ে একটু জিরিয়ে নেয়। নামগান করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কেউ একজন হয়তো মহাপ্রসাদের পাত্র একটা দিয়ে যায়। কেউ মাছের খবর নেয়, 'শোন দৈবকী, মেয়ে-জামাই এসেছে, দু একটা ভাল মাছ দিবি।' দৈবকীরা পুলটা পেরোতেই অস্তবেলার আলোয় কালো কালো মেয়েলোকগুলো পাকা কালো জামের মতো প্রগলভ্ হয়।

দৈবকী নামঘরের এলাকায় পা দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুরদুরান্তের কুঁড়েঘরে কুপিলম্ফের আলোগুলিও হারিয়ে যায়,সবদিকে নিস্চুপ অন্ধকার । দৈবকী একটা তাম্বুল বের করে মুখে দেয়। কোনদিনই সে এত রাত করে না,বেপারিরাও টাকা দিয়েছে ঠিকঠাক.তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। যদিও কিছুদিন থেকেই ওরা বড় দরদাম করছে। আজ ডিমাল,জ্যান্ত ঘনিয়া মাছ কটার জন্য যে দাম বলল তাতে তার ব্রহ্মতালু ভমভম করে ওঠে। মনের আনন্দে গালি দিয়ে পিক ফেলতে গিয়ে থমকে যায়। নামঘরের উল্টোদিকে খেতের জমিতে কিছু তীক্ষ্ণ আলোর রেখা, অগভীর জলে ফলই মাছের মতো উপরে নিচে লুটোপুটি খাচ্ছে। সে ওখানেই বসে পড়ে । মেঘের গর্জন আর বিদ্যুত,বেশ ঘন হয়ে আসছে। সে নামঘর দেখে হাত জোড় করে। 'আজ কী আতান্তরে পড়লাম প্রভু!' নামঘরে ঢুকার মুখেই একটা সরু বাঁশের পুল। পুলটার উপর সে বসে পড়ে। চমকিত বিদ্যুতের আলোয় দৈবকী স্পষ্ট দেখতে পায় বিলের জলে মৎসজীবীর পলো আর কুড়াজাল নিয়ে ভেলায় করে জালে ঘিরে ফেলার মতো মিলিটারিরা এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের জগৎবেড়ের মধ্যে যেন ধরা পড়েছে মস্তবড়ো এক বোয়াল মাছ। ধড়ফড় করছে। সে কিছু শব্দ শুনতে পায়, কাউকে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে, তার চারদিকেই যেন থেঁতলে ফেলা নাগরাজ সাপটি। আলোগুলি আবার ফলইমাছের ঝাঁক হয়। মিলিটারিদের ভেলায় বাঁধ ভেঙে গেছে। দৈবকী নামঘরের ফটকে হাত দেয়। এসে যাচ্ছে, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মিলিটারির ঝাঁক রাস্তার উপর এসে পড়েছে। গেট খুলতে তার শরীর শিহরিত হয়। কী করতে যাচ্ছে সে? প্রভুর নামঘরে ঢুকবে সে? দুয়ার খানি যেন বাঁশের ঘাটা নয়, পাথরের প্রাচীর। রাত্তিরে তো প্রায়ই গঙ্গা যমুনায় একখানা সোনার নৌকা ভেসে ওঠে। যে কেউ সেই নৌকা দেখেছে, রক্তবমি হয়ে মরে গেছে। তার যদি কিছু একটা হয়, কানা বুড়ি ছেলে মেয়ে নিয়ে কী করবে। সে খপ করে পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে যায়। দৌড়ে গিয়ে বটগাছের নীচে বসে পড়ে। মিলিটারিরা রাস্তায় উঠেছে। হঠাৎ চমকের আলো তাকে গ্রাস করে। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে একটা কঠিন কর্কশ শব্দ, 'কোন হ্যাঁয়?' সে এবার হামাগুড়ি দিয়ে বটগাছের এক খোঁড়লে ঢুকে যায়। জুতার মচমচ শব্দ। প্রায় একসঙ্গে গাড়িগুলি গর্জে ওঠে। একটুখানি সময় তো নয় যেন গোটা একটা দিন, গাড়ি কটা শহরের দিকে চলে যায়। গাছের খোঁড়লে এক দঙ্গল পিঁপড়ে। তার উপস্থিতিতে ওরা নড়াচড়া শুরু করে, দুটো পিঁপড়ে পিরপির করে তার গালে চড়ে বসে। কয়েকটা কামড়ও দেয়। না দেখেও বুঝতে

পারে এরা কালো পিঁপড়ে, ডিমের সঙ্গে পিঁপড়ে বাহিনির গন্ধ তার নাকে ভেসে বেড়ায়। সে গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে পুকুর গুলিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দৈবকী শরীর থেকে চাদরটা ফেলে দেয়, গরমের তাপে সে কড়ায়ে দেওয়া সাঁতলানো মাছের মতো হয়ে গেছে। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল না হলে যেন তার কলজে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। খাবে নাকি গঙ্গা যমুনার জল এককোষ? সে ধীরে ধীরে পুকুরের কাছে যায়। জলে কী একটা শব্দ হচ্ছে। যমুনার পারে স্পষ্ট একটা সরসর শব্দে জলের শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। তার বুকটা ধপধপ করে ওঠে। একবার রাতে গাঁয়ে ফেরার পথে পদ দাদার ছোটভাইও গঙ্গা যমুনায় খলখল শব্দ শুনে দৈবকী যশোদাকে দেখার জন্য নামঘরে ঢুকেছিল। পূর্ণিমার রাতে ডাকতেই ওরা চলে আসে পুলের নীচে। রাস্তায় খেতে খেতে আসা মটরভাজা দৈবকী যশোদার দিকে ছুঁড়ে দিতেই মহাদেবের কণ্ঠের মতো সে নীলবর্ণ হয়ে যায়। সরসর শব্দটা বটগাছের গর্ত থেকেই আসছে। সে ওখানে কী খুঁজতে গেছে? সেখানে সে তার গায়ের মৎসগন্ধ পিঁপড়ে পালের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে এসেছে। পদর ভাইএর শবটাও মানুষ ছুঁতে ভয় পেয়েছিল। ছুঁতে ভয় পাওয়া শবটা শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল? কারো কাছে সে তা জানতে পারেনি। কাক শকুনে খেয়েছিল নাকি সেই বাসি মড়া? সে নিজেই নিজের শরীর ছুঁয়ে দেখে, ঘামে ভিজে জবজব করছে। হাতের তালুতে সে মুখ মুছে, হাতে ডিমাল ঘনিয়া মাছের কড়া গন্ধ। এই গন্ধ নিয়েই সে! শুকনো খটখটে ঠোঁট একবার সে চেটে নেয়। একটু জল না খেলে সে পারবে না। গঙ্গা যমুনার সাঁকোয় নেমে গিয়ে এক আঁজলা জল হাত দিয়ে তুলতে গিয়ে উবু হয়েও পারে না। এই মাছের গন্ধে চ্যাটচ্যাটে হয়ে থাকা হাতে সে...। দৈবকী সাঁকোর উপর বসে পড়ে, তার পায়ে শীতল জলের পরশ। হাতের বড়শি থেকে লাফ মেরে পড়া চেঙমাছের মতো তার শরীর থেকে যেন হাতখানিও লাফ মেরে গিয়ে জলে পড়ে। উঠিয়ে আনে এককোষ জল। সে পরপর অনেক কোষ জল খায়, এক আঁজলা সে মাথায়ও ঢালে, 'প্রভু! পাপ হলে ক্ষমা করো।' সাঁকো থেকে উঠে আসবে বলে সে দাঁড়ায়, তার পা লেগে সাঁকোর জলে দুটো সরু রেখার সৃষ্টি হয়। কোথাও কোন শব্দ নেই, মেঘের গর্জন বন্ধ হয়ে গেছে, আকাশটাও তার গায়ের মতো ঘন কালো। গাছে পাতা নড়ছে না। হঠাৎ জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়। সে শব্দটা কান পেতে শুনে। মাছের ডানা ঝাপটানোর পরিচিত শব্দ নয়। দৈবকীর শরীর শিহরিত হয়। কে বলেছিল? কোথায় সে শুনেছিল? মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে বড় নামঘরে গঙ্গা যমুনার বুকে একটা সোনার নৌকা ভেসে ওঠে। নৌকার কাছে কাছে থাকে শেওলাধরা দুই কচ্ছপ। লোকে বলে তার যোয়ান পুরুষটি দুদিনের জ্বর পায়খানায় চলে যাওয়ার কারণটিও বড় গুঢ়। নামঘরের সামনের মাঠে কই মাছের উজান উঠেছিল, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভেজা শেষ অমাবস্যার রাতে ডাকাবুকো মানুষটা কারো বারণ না শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সকালে ফিরে আসার সময় সঙ্গে করে এনেছিল খলৈ ভরা হাতের তালুর মাপের লালচে রঙের কই মাছ। মানুষটার রক্ত পায়খানা

হয়েছিল। মানুষজন ফিশফিশ করে বলেছিল, অমাবস্যার রাতে সে নিশ্চয় গঙ্গা যমুনার সোনার নৌকা দেখছিল। না হলে ভাল মানুষটার এক রাতে কী করে এমন দশা হয়? উঠোনে ছড়িয়ে থাকা পাতলা পায়খানায় সোনার বরণ রক্তের টুকরোগুলি দেখে শাশুড়ি বুক চাপড়েছিল, ‘মহামড়ক ধরেছিল অমাবস্যার রাতে, তার উপর বাপ মরার দিন। সে কেন বড় নামঘরের সামনে ভুতুড়ে মাছ ধরতে গেল? পড়লই না হয় কই এর উজান। খাক, এবার মহামড়ক খাক।’ তারপর শাশুড়ি নাম না করে তাকেও গালমন্দ করেছে। দৈবকী এখন এই নিস্তব্ধতার মধ্যেও স্পষ্ট শুনতে পায় শাশুড়ির রাগও দুঃখের বিকৃত কণ্ঠস্বর, ‘খাক, মহামড়কে খাক।’ তাকেও যে লোভে ধরেছে। মেখলার কোমরে রাখা টাকা কটাও জ্বলন্ত আঙরা হয়ে পুড়েছে তাকে, বিচ্ছুটি পাতার মতো ডাকছে।

জলে শব্দটা বেশি হচ্ছে, তার পায়ে জল ছিটকে ছিটকে পড়েছে। আঁধার কমে আসা দৃষ্টিতে সে ভাল করে দেখে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ সাঁকোর কাছে বসে রয়েছে। দৈবকী পলো থেকে কই মাছের মতো লাফিয়ে পারে পৌঁছয়। সে কেঁপে কেঁপে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে। কচ্ছপটি সাঁকোর পায়ের পাতা ভেজানো জলে বসে আছে। দৈবকীর চোখ থেকে জল পড়ছে। পুকুরের দিকে তাকাতে ওর ভয় করছে। এখনই পুলটার উপর ভেসে উঠবে একটা সোনার নৌকা। একা একা ভেসে যাওয়া সোনার নৌকা। অপদেবতার ভর হওয়া এই নৌকা যে দেখে সেই রক্তবমি করে মরে যায়। জলে আবার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। সোনার নৌকার রক্ষক শেওলাভরা দুই কচ্ছপ। সে এবার পুকুরপার থেকে নামঘরের দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যায়, সে একবারও পিছন ফিরে তাকায় নি। নামঘরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেই মহিলারা নামগান করে। সিঁদুরে পুঁটিমাছের মতো সুন্দর, পাবদা মাছের মতো ফর্সা, মৃগেল মাছের আঁশের মতো উজ্জ্বল কাপড় পড়া মানবীরা এখানে নামগান করে। দৈবকী ছোটবেলা থেকে এই দৃশ্য দেখে আসছে। সে ওখানেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে। জলের শব্দ আর নেই। দেখব না দেখব না করেও সে নামঘরের ভিতরে তাকায়, একঝাঁক জোনাকি জ্বলছে ভিতরে। সে নামঘরের ভিতরে তাকিয়ে আবার প্রণাম করে।

সে ধীরে ধীরে নামঘরের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। হঠাৎ সামনের গাছপালা গুলি সোঁ সোঁ করে দুলতে থাকে। ধুমধাম করে আসি আসি করা বৃষ্টির ধারা নেমে আসে। নামঘরের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক মেয়ে মানুষটি আবার ঢুকে পড়ে ভিতরে। মহিলাদের নামগান করার জায়গায় বসে, বৃষ্টিতে ভিজে সে একসা। এবার নামঘরের টিনের চালে ঢং ঢং শব্দ হতে থাকে। গোল পাতিলেবুর মতো শিলাবৃষ্টি দৈবকীকে আঘাত করে। নামঘরের বিগ্রহ ঘর ‘মনিকূট’ এ তালা লাগানো থাকে, নামঘরের ঘরটাই শুধু খোলা। দৈবকী নামঘরের দুয়ার ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকে। শিলা বৃষ্টির আঘাত আর সহ্য করতে পারে না। সে ভিতরে ঢুকে। একপা ঢুকে আবার বেরিয়ে

যায়। আবার শিলাবৃষ্টি তাকে ছুঁড়ে ফেলে। ক্লান্ত শরীর আর দেয় না। সে এবার ধীরে ধীরে ঢুকে যায় ভিতরে।

নামঘরের ভিতরে বৃষ্টি নেই, কেবল গা হিম করা এক ঝাঁক ঠাণ্ডা বাতাস। ভিজে কাপড়ের সঙ্গে বাতাস লেগে গোটা শরীরটাই কেঁপে ওঠে। গায়ের কাপড় সে টানটান করে নিংড়ে নেয়, কাঁচা মাছের গন্ধ আবার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মনিকূট এর ভিতরে সে এবার শুনতে পায় সরসর শব্দটা। তিনিই তাহলে তাকে খুঁজছেন। সে এক দৃষ্টিতে মনিকূট এর দিকে তাকায়, লোহার জালিতে এক মস্ত তালা। জালির ভিতর দিয়ে সে দেখে বেদির উপর ফুলবোনা গামছা। প্রদীপ দানিতে এখনও দুটো প্রদীপ জ্বলছে, বিকেলে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। জোনাকির মতো দুটো আলোকে সে দেখে গামছার উপর সোনা ও রূপোর বিভিন্ন আকৃতির ফুল। সে মনিকূট এর দিকে তাকিয়ে প্রনাম করে একবার। বাইরের বেদিতেও একটি প্রদীপ জ্বলছিল, হঠাৎ নিভে যায়। নাম ঘরের এক কোনে থাকা ডোবায় টিনের উপর থেকে কিছু একটা পড়ে লাফ মেরে, একটা শব্দ হয়। দৈবকীর শরীর কেঁপে ওঠে। নামঘরের ডোবাটির পাশে সে আবার শুনতে পায় তার হাঁটাচলার শব্দ। জানা অজানা ধূপ ধূনার গন্ধ, সর্ষের তেল আর তুলোর সুতোর গন্ধ, নিকনো পুঁছানো মেঝের গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে মহাপ্রসাদের সুবাস -এতসব গন্ধ ছাপিয়ে নামঘরে ছড়িয়ে পড়েছে কাচা মাছের গন্ধ। সর্বদা মাছ বহন করা চুবড়িটায়ও বৃষ্টির জল পড়ে মাছের গন্ধ ক্রমশ বাড়ে। দৈবকীর বুক ধড়ফড় করে। সে একি করল? টগর ফুলের মতো ফর্সা সুগন্ধি মহিলাদেরও যেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না সেই নামঘরে সে মাছের গন্ধ ছড়িয়ে দিল। নুন ছেটানো মাগুর মাছের মতো দৈবকী ছটফট করে। তার মাথা ঘুরে। সেই কাকভোরে কটা পান্তাভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছিল দৈবকী, পেট গুলাচ্ছে এখন, নাড়ি ভুঁড়ি যেন বেরিয়ে আসবে। সে হড়হড়িয়ে বমি করে। গায়ের চাদরটা দিয়ে পিছল টকটক গন্ধের বমি মেঝে থেকে মুছে। বিজলা ভর্তি চাদরটার দিকে তাকাতে তার ভয় লাগে। এত রক্ত, চাপচাপ রক্ত। হ্যাঁ, এসব রক্ত। সে ধীরে নামঘরের মেঝোয় শরীর ফেলে দেয়। তার অর্ধচেতন মনটায় সরসর করতে থাকে দীর্ঘদেহী নাগরাজ, ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকে শ্যাওলা ধরা কচ্ছপ, ভাসতে থাকে সোনার নৌকা। একটা সময় সব অস্পষ্ট হয়ে যায়। শুধু রক্তের দাগ, পিচ্ছিল রক্তে ডুবে যাওয়া চাদরখানি যেন ক্রমে বড় হতে থাকে।

'শ্বাস নিচ্ছে।'

'নড়চড়া করছে'

'মরে নাই, মরে নাই'

‘উঠে বসেছে, মেয়ে লোকটি উঠে বসেছে।’

একদল মেয়ে মানুষের চিৎকারে দৈবকী উঠে বসে। চোখ দুটো ঘষে সে তাকায়, সে যে বড় নামঘরের ভিতর বসে আছে। বাইরে এক দঙ্গল মেয়ে মানুষ। পাথরগুলির মতো ঠং ঠং করে আঘাত করা শিলাবৃষ্টি এখন নেই। রক্তে ভেজা চাদরখানি? সে গায়ের মলিন ছিন্ন চাদর খানির দিকে তাকায়, জায়গায় জায়গায় করাল মরা বমির হলুদ দাগ। সোনার নৌকা? বড় কচ্ছপ? সরসর শব্দ করে ঘুরে বেড়ানো দীর্ঘদেহী? নিভু নিভু প্রদীপের আলোয় জ্বলজ্বল করা সোনার ফুল, রূপোর ফুলগুলি? সে চোখ কচলে মনিকূটের ভিতরে দেখে। সোনারূপার ফুলগুলি, প্রদীপদানি, কাঁসার বড় বড় সরাই, দিনের আলোয় স্পষ্ট উজ্জ্বল দেখাচ্চে। দৈবকী মনিকূট এর দিকে তাকিয়ে একবার প্রণাম করে, তারপর গায়ের চাদর ঠিক করে নামঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দুর্বলতায় তার মাথা ঘুরে। টালমাটাল পদক্ষেপ মহিলাদের নামকীর্তনের জায়গায় এসে দৈবকী ধপ করে বসে পড়ে।

‘এ তো দেখছি দৈবকী মেছুনি।’ বটগাছের নীচে বসে থাকা সিঁন্দুরী পুঁটির মতো সুন্দরীদের একজন বলে। ওরা সবাই আজ নাম প্রসঙ্গ করতে এসেছে। বিকেলে নামঘরে জ্ঞানীগুনি সাধুজনদের সমাবেশ আছে। নামগাম শুরু করার আগে মহিলারা নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে মনিকূট এর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করতে গিয়েই হই হই করে ওঠে। মনিকূট এর কাছেই একজন মেয়েমানুষ পড়ে আছে। নামঘরের দেখাশোনার অধিকারী নামঘরিয়া থাকেন কিছু দূরে, তার আসতে দেরি হবে। মেয়ে মানুষ হয়ে, নারীজন্ম নিয়ে কী করে নামঘরের ভিতরে পা রাখে? নামঘরিয়াকে খবর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে খবর চাউর হয়ে যায়। পবিত্র বড় নামঘরে একজন ডুমুনী ঢুকে গেছে। খবর পেয়েই মানুষ দ্রুত নামঘরের দিকে আসতে থাকে।

সত্যি একজন ডুমুনি মেয়েমানুষ নামঘরের দরজায় মুখ গুঁজে বসে আছে।

‘এই মেছুনি দোকানীর কাছ থেকে আমি প্রায়ই মাছ কিনি’।

‘সে ঐ গাঁয়ে থাকে।’ কেউ নদীর ওপারের, সেতুর ওপারের গ্রামখানির দিকে আঙুল তুলে দেখায়’

সে নামঘরে কী করে ঢুকল? বহুজন বহুধরণে একটাই প্রশ্ন করে।

‘দেশে আগুণ জ্বলবে না তো কী? মেছুনি মেয়েছেলে ভগবানের পবিত্র ধামে ঢুকে যাচ্ছে?’ কোন একজন বড় বড় কথায় চিৎকার করে ওঠে।

‘অনর্থ হবে, দেশে আরও আগুণ জ্বলবে।’ বৃদ্ধ বনমালী শর্মা বুক চাপড়াতে থাকে।

‘আমাদের মহিলাদেরও এই পবিত্রধামে পা দিতে দিই না, আর তুই ডুমুনি বেটি...।’ কৃষ্ণমোহন্ত রাগে কাঁপে।

‘মেয়ে মানুষের অশুচি দেহ নিয়ে তোর নামঘরে ঢুকতে ভয় লাগে নি?’ বরুয়াগিন্নির কথা গুলিই এক অদ্ভুত ভয়ে কেঁপে ওঠে।

‘মরবে, সে রক্তবমি করে মরবে’। শইকিয়া গিন্নিও আঙুল মটকে মটকে সায় দিলেন।
দৈবকী দুই হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, আবার বসে পড়ে। মাথা ঘুরে যায়। তার উপবাসী পেটে পিত্ত উথলায়। একহাতে কপাল চেপে সে সে বমি করে। দুর্গন্ধময় হলুদ বর্ণের বমিতে জায়গাটা ভিজে যায়। বমি বেরিয়ে যাওয়ার পেটে ব্যথা, কামড়ানি বন্ধ হয়, শরীর একটু হালকা লাগে। সে এবার দাঁড়ায়। মানুষের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে সে কিছু একটা বলতে চায়, ‘মিলিটারি, শিলাবৃষ্টি...।’ সে উঠতেই মেখলার কোমর থেকে একটা একশ টাকা একটা পঞ্চাশ কয়েকটা দশ টাকার নোট পড়ে যায়।
‘এত গুলো টাকা সে কোত্থেকে পেল?’ সারাজীবনে নিজের ইচ্ছায় একশ টাকা খর্চ করতে পারে নি, একটাকা অর্জন করতে পারেনি যে মোহন্তগিন্নি, তিনি চিৎকার করে ওঠেন।
‘নিশ্চয় চুরি করে এসে নামঘরে ঢুকেছিল।’
‘কে জানে নামঘরের সোনার ফুল, রূপার ফুল...।’
‘দেখুন তো নামঘরিয়া কিছু খোয়া গেছে কী না?’
‘এই ছোটজাতের মানুষের কী বিশ্বাস? কী মতলবে নামঘরে ঢুকেছিল?’
মানুষগুলি উত্তেজিত হয়। দৈবকী টাকাগুলি জড়ো করে নেয়।
‘মায়েরা দেখুন না শরীর মাথা চটকে, কত কিছু নিয়ে রেখেছে।’
কেউ একজন কৌতুকের সুরে বলে। সম্মিলিত এক হাসির শব্দ হয়।
দাঁড়িয়ে থাকা দৈবকীর ছেঁড়া মলিন চাদর মেখলার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়া পুরুষ্ঠু মাগুর মাছের মতো ভরপুর দেহটাকে পুরুষেরা চেটে পুটে নিচ্ছে। তাঁতের সুতোর ভিতর দিয়ে যাওয়া সরু বাঁশের মাকুর মতো বরুয়া গিন্নি হঠাৎ দেখে তার স্বামী দৈবকীর ব্লাউজহীন ভরন্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন। বরুয়া গিন্নি লাফ মেরে গিয়ে দৈবকীর চুলমুঠি ধরে বলে,
‘শাখা সিন্দুর বিহীন মেয়ে মানুষের কী বিশ্বাস? কোন প্রেমিককে নিয়ে তুই এখানে ঢুকেছিলি?’
‘ঠিক ঠিক, সে যে মতলবেই আসুক, সঙ্গে কেউ ছিল নিশ্চয়’
‘কে ছিল তোর সঙ্গে?’
‘কোথায় গেল সে?’
গালাগালিগুলি পাতিলেবুর মতো শিলাবৃষ্টির থেকেও জোরে আঘাত করে দৈবকীকে। মুখরা ডুমুনিও মূক হয়ে যায়। হঠাৎ সে নামঘরের দুয়ার মুখে বাঁশের সাঁকোর উপর একটা ছোট কালো রঙের বাচ্চাকে দেখতে পায়। ছেলেটা তার দিকে একবার তাকিয়ে সেতুর দিকে দৌড়ে চলে যায়।
কেউ একজন একহাতে নাক ধরে, অন্যহাতে চুবড়িতে থাকা চাল আলুর ঠোঙা টিপে টিপে দেখে, ‘কী আছে এতে?’ দৈবকীর মাথা ভম্‌ভম করে। মেছুনিকে এরা চোর বলছে, তার খাটনির পয়সা চুরির

বলছে, কাণি বুড়ির জন্য আনা কয়েকটা আলুও চুরির বস্তু বলছে। মাগুর মাছ ধরতে গেলে যেমন মাছ কাঁটা মেলে দেয় তেমনি সেও দুখানি হাত মেলে দেয়, তার কালো শরীরে যে সিঙি মাছের বিষ। চালের ঠোঙা টিপতে থাকা মেয়েলোকটিকে সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। দৈবকী যেন বাতাসে একটা চেনা গন্ধ পায়। মানুষজন ঘুরে ঘুরে সেতুর দিকটা দেখছে। রোদে ঝলসানো অনেকগুলো কালো শরীরের মানুষ সেতু পেরিয়ে দ্রুত নামঘরের দিকে আসছে। একঝাঁক চেঙমাছের পোনার মতো মানুষ দলবদ্ধ হয়ে আসছে। দৈবকী এবার ওদিকে তাকিয়ে তার পরিচিত ভঙ্গিতে উরাতে থাবড়া মারে, 'হ্যাঁ, আমি মেয়েমানুষ, আমি বিধবা, আমি পেটে বাচ্চা ধরেছি। আমি ডুমুনি, আমি মাছ মেরে খাই। আমি বড় নামঘরের ঢুকে পাপ করেছি। কিন্তু আমি চোর নই, গতরাতে মিলিটারির ভয়ে, শিলাবৃষ্টিতে...।' তার কথা শেষ হয় না। চারদিক থেকে চড় থাপ্পড় চলতে থাকে তার গায়ে। মেলে দেওয়া ধানে তার ছায়া পড়লেও, হিংস্র মানুষগুলির ছায়ায় সে লুকিয়ে পড়ে। মা মা বলে চিৎকার করে একটা কালো রঙের বাচ্চা ছেলে নামঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। কেউ তাকে একটা ধাক্কা মারে। মানুষের ভিড়ের মধ্যে অন্ধকার থেকে দৈবকী গগন বিদারি চিৎকার দেয়, 'আমাকে মারিস না রে ... কানি বুড়ির কাছে আমার ছেলে মেয়ে...।' চিৎকার গিয়ে বড় নামঘরের দেউড়ির সাঁকোর কাছে থেমে থাকা কালো মানুষের মধ্যে চেঙ মাছের মধ্যে বড়শির মতো গিয়ে পড়ে। মানুষগুলি উজ্জীবিত হয়। মাছধরার চেপা ঢেলে দেওয়া একঝাঁক কই মাছের মতো মানুষগুলো পিলপিল করে তিনপুরুষে পা না দেওয়া বড় নামঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। কানি বুড়িও এর গায়ে হাত দিয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৈবকীর চিৎকারের দিকে এগিয়ে যায়, 'দৈবকী তোকে কে কী করে দেখি। আমার ছেলের মতো সন্তান তুই। এই কানি বুড়ি যৌবন কালে পলোর ভিতর এক থাবড়ায় এক একটা পাকা রউ মেরেছে রে। বুড়ি এখনও মরে নি, দৈবকী!'

*****

লখেতরা

লখেতরা

রবীন শর্মা

একদিন একটা বনপায়রা উড়ে এসে বসে লখেতরা নদীর পারে। দিনটি ছিল শুক্রবার। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। গরুর পালকে নদীর ঘাটে জল খাইয়ে , চারণক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে নাগকেশর গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল এক রাখাল। পায়রাটিও এসে বসে তার কাছে। সর্ষেখেতের মতো সুগন্ধবহ সৌম্যকণ্ঠে সে শুধায়, ‘কু কু কুউ... কু... বুকের মাঝে সারে সারে বেজেছিল তোমার বংশীধ্বনি , আজ কেন হে বাজে না কানে ?’

সামনের বালুচরে আটকে থাকা হাঁটুসমান জল, নিস্তরঙ্গ লখেতরা। নদীর মতোই নিস্তেজ নিরন্ন এই গোরক্ষক যুবকটিও। এক কুড়ি বসন্ত পেরিয়ে এসেছে সে, অথচ অনবরত অশ্রুসজল তার চোখ জোড়ায় জীবনের রিক্ততাই শুধু। এখানে সেখানে নানান রঙের কাপড়ে তালিমারা আলখাল্লার মতো পরিধেয়টিই যেন তার বহুমাত্রিক জীবনের রূপকথা। জন্মের একপক্ষ কালেই সে হারিয়েছিল মাতৃস্নেহের অমৃত। কৈশোরের স্বপ্ন প্রজাপতির রং মুছে গিয়েছিল পিতার মুখাগ্নিতে, লখেতরার পারে। আর বাসন্তী ? থাক, তার থেকেও বড়ো কথা দুনিয়াটাই তো ছলনা করেছে তার সঙ্গে, যখন আবিষ্কার করেছিল সে জন্মমূক, কণ্ঠস্বরহীন।

পায়রার বকম বকমে সে বিমর্ষতা প্রকাশ করে। বলে, ‘এ এ অ... ডালের পাখি ডালেই থাক, বুঝবি নে তুই আমার বুক ভরা দুঃখ।’

বকুনি গেয়ে বারদুয়েক এদিক – ওদিক ঘুরে পায়রাটি আবার বলে, ‘কু কু ... তুমিই বলেছিলে পশ্চিমা বাতাস বইলে আসবে, বাঁশির সুরে মালিনীর দেশে নেবে উড়িয়ে , ওহে মিষ্টি পাখি যাবে না ?’

আত্মাভিমানের বেদনায় , ভাবাবেগে অস্পষ্ট স্বরে গোরক্ষক বলে, ‘ অ অ ... গেছে যে সময় থেকে এমন শ্বয়...এত দীর্ঘ উপলব্যথিত যাত্রাপথ , জেএটিএনএওয়াই পেরিয়ে যাচ্ছি দিন, ভুলে গেলি , এনেছিলি সেদিন , তোর মধুঝরা কলকাকল ?’

কপোতটির মন আর্দ্র হয়। দুঃখের বকবকমে বলে, ‘কু কু ...আসছি রে ভাই তোমার কষ্টের প্রাঙ্গণভরা ক্রন্দন শুনতে ...।’

রাগ হয় রাখাল যুবকের । হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে পায়রাটিকে তাড়িয়ে কুপিত স্বরে বলে, ‘এ এ ... কার কথা শুনবে , তোমার এই একটুখানি বক্ষ কী সইতে পারবে...।’

পায়রাটি গভীর নিশ্বাসে বলে, ‘ কু কু ... বাঁশিটা বাজাও ভাই , পথ কেটে জল দাও , তোমার দুঃখের দূর্বাবনে এনে দিই একটুকরো রোদ , তার থেকে না হয় দিও আমায় একটুখানি খুদ ...।’

কাঠুরিয়ার কুড়ুলের আঘাতে দ্বিপ্রহরের গাম্ভীর্য দীর্ঘায়ত , নদীর দুই পারেও নিস্তব্ধতা । মাঝে মাঝে ঝাউ আর কাশের বনে বসন্তের শিস দিয়ে ডাকে কেউ। কিন্তু এত আয়োজন সত্ত্বেও বনসংগীতের সুবাসভরা পবনে বয় না কোনো ময়ূরপঙ্খী ।

বিগত রাতের কথা। তাই বা কেন, তারও আগের কথা, আগের দিন কেন বলতে গেলে বিগত মাসটা, মাস কেন যদি বলি বছরের কথা, ভুল হবে না। লখেতরার পারে ছোটো ছোটো কয়েকখানি গ্রাম – কয়াজানি, রাজাবাড়ি, পানিচলা এসবেই হিরণ্যকশিপুর তাণ্ডব । দিন নেই রাত নেই , ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধরত সৈনিক নামছে। চারদিকে হরিণ – মারা ফাঁদ পেতে গ্রামের ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরের বাচ্চা মেয়ে- পুরুষ সবাইকে টেনে বের করে । কিছু অচেনা মানুষের নাম নিয়ে বলে, ওরা এসেছিল ? ভাত খেয়েছিল এখানে, কার ঘরে ? এমন উদ্ভট প্রশ্ন। ভয়ে কম্পমান গ্রামবাসী স্পষ্ট উত্তর দিতে না পারলে লাথি মারে, বন্দুকের কুন্দা দিয়ে খুঁচিয়ে ...।

দিনের বেলা শ্মশান হয়ে থাকে গ্রামগুলি । গোহালের গরু গোহালেই হাম্বা হাম্বা করে, তৃণভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সাহস হয় না কারো। এমন সময় আবার ফিরে আসে কপোতটি। গোপাল যুবকটির কাছ থেকে সেই ভয়ানক রাতের বিভীষিকার কথা শুনতে। কী বলো, কম না কি রাখালটির মনোব্যথা, মনের কথা ---

তার নাম মাধব। গ্রামের বয়স্কজনেরা ডাকে মাধা। খিকখিকিয়ে রং – তামাসায় বয়সিরা ডাকে বেভা । শিকনি – কাটা বাচ্চাকটাও তাকে ছাড়ে না, ভেংচি কেটে গায়--- এংকরি বেংকরি বেভা দাদায় বাঁশি বাজায় বাসন্তীর নামে , ভেংকরি । বলতে পারো , কে এই বাসন্তী ? বলব, তার আগে সংক্ষেপে বলে নিই শোকে দুঃখে কাটানো তার জরাজীর্ণ জীবনের দুটি কথা।

লখেতরার পারে ছোটো গ্রাম কয়াজানি। কুড়ি ঘর মানুষ, বাঁশ বেতের বেড়া দেওয়া কুড়িখানা কুঁড়েঘর। নুন- ভাতে একসময় এরা ছিল কৃষিজীবী। হাজোর মাধবমন্দিরের সেবাইত –এর খাসরায়ত। যদিও কালক্রমে আইন- আদালত এবং রায়তিস্বত্বের উপর কাঁকড়ার দাঁড়া চেপে বসায়, খেতের জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয় তাদের।

মাধবের বাপ হলধর, বংশানুক্রমে ছিল মন্দিরের দণ্ডধারী পাইক। সেই সুবাদে হলধর সেবাইতের হাতে পায়ে ধরায়, তাদের সম্প্রদায়ের কুড়ি ঘরকে, লখে তরার পারের কয়াজানিতে থাকার সুবিধা করে দেয়, সাতদলায় তাদের ভাগের জমির রায়তিস্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার শর্তে টিপসইও একটা দিতে হয়।

কয়াজানিতে এদের বসত তো হল, খেতের জমি কই ? চারদিকে তো শুধু ঝিল আর বিলের শান্ত জল। যদিও বছরে দুবার করে লখেতরাও অশান্ত হয়। হলধরের বাপ তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। সে সবাইকে ডেকে বলে কথায় আছে যার ভাত তার মাত, আজ থেকে আমরা মৎস্যজীবী হলাম, খাল বিলকে জীবীকা করে নিলাম।

সেই সূত্রে ওরা কেওট, মাছুয়া ।

হলধরের বুকে একটা গভীর কান্না ছিল। তার ছেলেমেয়ে বাঁচে না। কোনোটা গর্ভাবস্থায়, কোনোটা একমাস, প্রতিবারই কলাপাতায় জড়িয়ে, বুকের ধন লখেতরায় বিসর্জন দেয়। বয়স্ক দু – একজন বলে মাধা গোঁসাইর শাপ লেগেছে। পিতৃপিতামহের বৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার জন্যই এই বিপত্তি ।

হলধরেরও কথাটায় প্রত্যয় হয়। সেই থেকে টানা তিন বছর সে মণিকূট – এর পূজা করে। চতুর্থ বছরে হয় ছেলে , এ তো মাধা – গোঁসাইয়েরই আশীর্বাদ। তাই তার নাম রাখা হয় মাধব, মাধা। এরপর জন্মের একপক্ষও হল না , সুতিকায় ভুগে, বাচ্চাটিকে তৃষ্ণার অমৃত থেকে বঞ্চিত করে তার মা । লখেতরার পারে চিতার আগুনে হলধরের সংসার ফুটো হয়ে যায় । এখন সদ্যক্রন্দনরত শিশুটিকেই বা কে কোলে তুলে নেয় ! একটা বন্দোবস্ত হয় । সন্তানসন্ততিহীন ঘরের প্রথম শিশুটিকে গ্রামের যে – কোনো দোকানি বৌকে বেচে দেওয়ার প্রথা তাদের। মাধবজন্মের তিনদিনের দিন তাদেরই সম্প্রদায়ের কণ্ঠিবাই – এর কাছে বেচে দেওয়া হয়, নামেই বিক্রি, প্রথারক্ষা। হলধর এই লোকাচারটি রক্ষা করেছিল ।

যখন কণ্ঠিবাই-এর কথাই উঠল, ছোটো করে বলে রাখি অন্য একটি কথা। বাইও যেন জীবনযন্ত্রণার একটি মাকু। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা পরেও সে স্বামীহারা। সুবিধাই হয় , কেন, বলছি সে কথাই। তিনমাসের এক ফুটফুটে সোনামণি মেয়েকে ছেড়ে স্বামী তার মুকালমোয়ার এক মহিলার মাচান ভাগ করতে যাবে বলে বেরিয়েছিল । সেই নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছুদিন ধরেই বিস্তর কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি । সহ্যের সীমা বেড়া ভাঙতেই, একদিন বাই রণচণ্ডীরূপ ধারণ করে , মাছকাটার বঁটি নিয়ে তাড়া করে স্বামীকে। মরদটাও বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে কোনোমতে ভীত হরিণের মতো দৌড়োল, তারপরে আর গাঁয়ে দেখা যায়নি তাকে। এক কোপে এক কলার মোচা কেটে সেদিন কণ্ঠিবাই বলেছিল, ঢেমনা – পু।

হলধরের বিষণ্ণ তথা আদ্র হৃদয়ের অবস্থা দেখে কণ্ঠিবাই দেউর চোখ ছলছল করে । দূর সম্পর্কের হলধরকে সে মিমি বলে ডাকে । সে মাধা গোঁসাইয়ের নাম নিয়ে হলধরকে বাচ্চাটি দেওয়ার জন্য হাত পাতে । বলে – আমার বাচ্চাটি যা খাবে সেও খাবে । কালিয়ে গোঁসাই যশোদার দুধ খেয়েছিল যেমন ।

কণ্ঠিবাইয়ের প্রসারিত হাত দুখানি মাতৃত্বের শুভ্র ও বিশ্বস্ত আশ্রয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হলধর অনুভব করে তার বিধ্বস্ত জীবনকে যেন নতুন করে মহিমান্বিত করতেই এই প্রসারণ। শিশুটিকে ক্রমাগত চুম্বন করে , থেকে থেকে অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে বাইয়ের হাতে তাকে তুলে দেয়। বলে, জেনো এ আমার আত্মা , তোমার অমৃতে যদি একে বঁচিয়ে তুলতে পারো তবে তোমাকে মা বলেই ডাকব।

এরপরের কথা বললে শোক আঘাত দেবে, না বললেও দোষ কম হবে না। কণ্ঠিবাইয়ের দেবোপম অমৃত বাঁচিয়ে দেয় দুটি প্রাণীকে। বাসন্তী আর মাধব । বাসন্তী নিজের , মাধব হলধরের। ধূলায় ধূসর সুপুরি পাতার গাড়ি টেনে, ওরা কণ্ঠিবাইয়ের ভাঙা কুঁড়ের হাসিকান্না হয়ে ওঠে। এর মধ্যে একদিন ধরা পড়ে, বাসন্তী যেমন বকবক করে কথার মধু ঝরাতে পারে মাধব পারে না। কিছু একটা বলতে চাইলে সে মুখ তো খোলে , গোটা শরীরের বল প্রয়োগ করার পর 'এ এ' বলে দুটো শব্দ বেরোয়।

তার মানে? এও কী মাধা গোঁসাইয়ের লীলা নাকি? জড়িবুটি ঔষধপত্র ঝাঁড়ফুক সবকিছু করেও হলধর মাধবের মুখ থেকে একবারও পিতা শব্দ বের করতে না পারায়, তেমন বয়স না হলেও শোকের আঘাতে মানুষটি অকালেই বৃদ্ধ হয়ে যায় । তার উপর জীবিকার জন্যও তার মহাযুদ্ধ । খালবিলের চুনোমাছ কী আর ক্ষুধার ভাত জোগাতে পারে ? এজন্যেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই মাছধরার বৃত্তি ছেড়ে অন্য উপায় ধরেছে। পাঁচ – ছয় ঘর মানুষ এখনো জাল খলুই –এর উপর নির্ভরশীল । সেই ক-ঘরের ভাত তো নয় ভাতের মাড়ের উপরও আরম্ভ হয় অন্য এক আক্রমণ। সত্রের পুরোহিতরা হলধরের থাকার সুবিধা করে দেয় কিন্তু খালবিলের অধিকার দেয়নি। কালক্রমে সেসব আধাসরকারি আধাদালালদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। তারা আবার বছরে দুবার বিলের ডাক দিয়ে মহলাদার মহাজনকে ডেকে নেয় । তখন ভাটির দেশের বিপুল সংখ্যক মাছুয়া দিয়ে দুতিন দিনের ভিতর বিলের সব মাছ চেঁছেপুঁছে উঠিয়ে নেয়। হলধরের জন্য থাকে শুধু পুঁটি খলসের পোনা। এই নিয়ে ভাটির দেশের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে হলধরের নিত্যি খটাখটি । মহলাদার রাগে তাদের উপর। গড়গরিয়ে বলে, আমি এখানে হরতন চিরতন খেলতে আসিনি , দস্তুরমতো টাকা ঢেলে বিল কিনেছি , শোল, সিংগি যা আছে সব আমার । জাল পাততে দেব না , দেখি কার এত সাহস , যা যা গিয়ে পেতে আয় দেখি।

একদিনের কথা। সূর্য পাটে যাওয়ার পর, হলধর ফিরছিল হাট থেকে । লখেতরা পেরিয়ে বিলের পার ধরে আসতে আসতে হঠাৎ চোখে পড়ে কচুরিপানায় ভরা খালের জলে মাছের খলবলানি । ভালো করে চেয়ে দেখে দুটো প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ । হঠাৎ করে তার মনটা বড়ো উদাস হয়ে যায় । একবার বোবা মাঢবকে সে মেডিকেলে দেখিয়েছিল । ডাক্তার অনেক যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে হলধরকে উপদেশ দিয়েছিল বাইরের কোনো ভালো কণ্ঠ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখাতে । ডাক্তারের মতে টাকা জোগাড় করতে পারলে, তার কথা বলার সম্ভাবনা পুরো মাত্রায় আছে ।

মাছ দুটোই হলধরের মনকে আশা আর উত্তেজনায় ভরিয়ে দেয় । সেই মুহূর্তে সে সবকিছু মনচাপা দিয়ে ঘরমুখো হয় । রাতদুপুরেই আসতে হবে , যেতে যেতে সে মনস্থির করে, মহলাদারের লোকজন রাতে পাহারা দেয় , ওদের লুকিয়েই আসতে হবে । এভাবে সর্বক্ষণ সে মাধা গোঁসাইয়ের নাম নিতে থাকে – প্রভু , মাছকটা যেন বেরিয়ে না যায় ।

আষাঢ় মাস। সন্ধেবেলা থেকেই আকাশের মনভার। রাতেই শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়--কথার শব্দ যায় না শোনা এমন খরবায়ু, গগন ব্যেপে মহামেঘের আন্দোলন। বিজুলি চমকে ক্ষণে ক্ষণে , লাগে ঝিকিমিকি আসি চোখের পলকে ...। গাছপালা, দুঃখী মানুষের ভাঙা কুঁড়েঘর ভাঙচুর করে ঝড় শান্ত হয় যখন প্রভাত পাখির ডাক শোনা যায়। রক্তগোলা সূর্যও তখন মুখ তুলে তাকিয়েছে ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত গ্রামগুলির দিকে।

সেই সকালেই গ্রামের মানুষ খালের পারে আবিষ্কার করে হলধরকে , বুকে পিঠে অনেক জায়গায় বল্লমের ঘা। রাতের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে রক্তের দাগ । তার ডান হাতের মুঠোয় ধরা দাখানিতে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছিল শুধু । সত্যমিথ্যা জানি না, সেই সকালেই নাকি মাধবের মুখে প্রথমবারের মতো কথা ফুটেছিল । পি-পি-তা...পি-পি-তা । তারপর আর কোনোদিনই শোনা যায় নি । হয়ত লখেতরার ঢেউ –এ লখিন্দরের ভেলাখানি ভেসে যাওয়ার মতো তারও হৃদয়চাপা কান্নাগুলি , স্নেহের পিতা শব্দের সঙ্গে চিরদিনের জন্য চলে যায় । আর ফিরে আসে না ।

এখন যদি বাসন্তীর কথা শুনতে চাও, তাহলে বলছি এই বেলা ---

পিতার মৃত্যুর পর জ্যাঠা এসে মাধবকে কণ্ঠিবাই দেউর কাছ থেকে নিয়ে যায়, বলে –আমার ওখানেই খার – পান্তা খাবে , বাড়ির কাঠকুটো , গরুছাগল দেখবে ।

তার কথায় কণ্ঠিবাই মৃত্যুসম আঘাত পায় । বলে—আমি কী ওকে শুধু দুমুঠো খাইয়েছি মাত্র ? সে আমার কলজের একদিক হে, বাসন্তী যা সেও তা । জ্যাঠা বলে , তুমি দুঃখ কোরো না , হলধরের বংশে তেতো লাউ জাতে না জন্মায় তার জন্যেই নিতে এসেছি ... আর মাধা গোঁসাইও তো দৈবকীর কাছে এসেছিলেন , তা বলে কি যশোদা তার মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল ?

পানের পুঁটলি বেঁধে কন্যা বিদায়ের মতো, কণ্ঠিবাই সেদিন মাধবকে জ্যাঠার হাতে তুলে দিয়েছিল । বলেছিল --- আজ থেকে আমার ঘর অন্ধকার ... যা বাপু যা নিজের ঘরে যা ...। দুয়ারের কোণে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল বাসন্তী । তাকে দেখে বৃদ্ধ জ্যাঠারও দুগালের দুধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে । বলে, একটাই গ্রাম , একই মাঠ , একই নদীর ঘাট , আসা যাওয়া তো লেগেই থাকবে ...।

থাকেও তাই । জীবিকার প্রয়োজনে কণ্ঠিবাই দিনের বেলা যায় দূরের হাটে, মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে । তার মধ্যেই মাধবকে বলে যায় স্নেহের দুকথা, কখনো হাটের বিস্কুট, আর কখনো – বা বাসন্তীর হাত দিয়ে পাঠায় তার প্রিয় ব্যঞ্জন মাছের টকঝোল।

মাধব তো শুধু কথা বলতে পারে না , দেখা – শোনায় , স্বভাব – চরিত্রে সে অতি অমায়িক । কোঁকরা চুলের মুখখানিতে সর্বদা লেগে থাকে মধুময় এক অনির্বচনীয় হাসি । গ্রামবাসীর যে –কোনো প্রয়োজনে , যে –কোনো কাজে , পারুক না পারুক সে এগিয়ে যায় । গ্রামের মানুষও খুশি হয়ে তাকে কেউ দেয় গেঞ্জি নিমাগামছা , কেউ দেয় পুরোনো ছেঁড়া কোটজামা ।

বাসন্তী তাকে দেয় সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, একটি বাঁশি । রামদিয়ার মেলা থেকে কিনে আনে । নিজের জন্যও কেনে রংবেরং – এর কাচের চুড়ি । সে আজকাল মেখলা চাদর পরে । মা- ও খড়কুটো জড়ো করার মতো করে এনে দেয় গন্ধতেল , লাক্স সাবান , একজোড়ো , আয়না চিরুনি আর বাড়ির কোণে বানিয়ে দেয় সুপুরি পাতার বেড়া দেওয়া চানঘর ।

বাঁশিটা পেয়ে সেদিন মাধব যেন এক ছেলেমানুষ । বাঁশির ফুঁ শব্দে সে ফিরে পায় তার কণ্ঠের ভাষা । ওদিকে মেলা থেকে ঘরে ফিরে বাসন্তীর অন্য বিপত্তি । বেছে বেছে সযত্নে কেনা চুড়িগুলি যে হাতে ঢোকে না । জোর করে ঢোকাতে গিয়ে দুখানা ভাঙে । মাকে বুঝ দিয়ে বলে, হাতে সাবান মেখে তবেই কাচের চুড়ি পরতে হয় , নইলে ভাঙে । পরদিন লখেতরার পারে বাঁশিতে ফুঁ লাগিয়ে ছাগলের পালের মাঝখানে বসেছিল মাধব । বাসন্তীও উপস্থিত । বলে, ও মাধ, আমি হাতে সাবান ঘষছি , তুই আমার হাতে চুড়ি কটা পরিয়ে দে তো । এই বলে নদীর জলে হাত ডুবিয়ে , হাতে সাবান ঘষে , চুড়ি কটা মাধবের দিকে এগিয়ে দেয় । মাধবও ধরে পরাবে বলে চুড়িখানা নিতেই , হঠাৎ কী হল কীজানি , তার বুকের ভিতর বৈশাখ মাসের আকাশের মতো গনগনে হয়ে ওঠে । গোটা শরীরে কাঁপুনি তুলে এক বিদ্যুৎ চমক শিরশিরিয়ে যায় ।

সে বাসন্তীর মুখে তাকাতেই মনে হয় , যেন সিঁদুরে পুঁটিমাছের মতো ঝলমল করছে ।

চুড়িগুলিও পিছলে বাসন্তীর হাতে ঢুকে যায় । তার বাঁশিতে বিবাহগীতির সুর যেন উলু দিয়ে ওঠে --- ধান পাকে অঘ্রাণে, কোকিল ডাকে ফাগুনে --- সখি হে ... ।

নতুন জলের ঢেউ খেলছে লখেতরায় । শ্রাবণে সে গর্ভবতী হবে । ফেনায় ফেনায় ঢল নেমেছে , দুকুলপ্লাবী বর্ষার রণচণ্ডী ।

শোনো বলছি, এবার সেই রাতের কাহিনি ।

কণ্ঠিবাই রাতের ভাত বেড়েছে । এমন সময় দরজায় কে যেন ডাকে, মাগো দরজাটা খোলো । অচেনা কণ্ঠস্বর । কণ্ঠিবাই আর বাসন্তীর বুক মোচড় দিয়ে ওঠে । সাহসে বুক বেঁধে বাই অর্ধমৃতের মতো বলে, কে ?

মা আমি, দরজাটা খোলো । উত্তর আসে ।

বাসন্তীও ভয় পায় । মায়ের হাত চেপে ধরে । বাই লম্ফটা উঠিয়ে দরজায় হুড়কো খুলে সামান্য ফাঁক করে দেখে ---একজন অচেনা সুঠামদেহী যুবক। বাপু, তুমি কে? বাই বলে । দেখ আমাকে ভিতরে

যেতে দাও, বলছি--- যুবকটি সামান্য ঠেলেই ভিতরে ঢুকে এবং দরজা বন্ধ করে দেয় । বাই দেউর হাতের লম্ফটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় । বাই আর বাসন্তী ভয়ে কাতর হয়ে অন্ধকার একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ।

যুবকটি বলে, মা ভয় পেয়ো না, তোমার ভালোর জন্যই আমি আলো নিভিয়েছি। পুলিশ আমায় খুঁজছে। আজ তিনদিন কিছু খাইনি, এক গ্রাস ভাত দেবে মা, কথা দিচ্ছি ভাতটুকু খেয়েই আমি চলে যাব। যুবকটি প্রায় এক নিশ্বাসে কথাকটি বলে।

বাই দেউর তখন মনে পড়ে গ্রামে মাছ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যে কথাগুলি সে শুনছে সব মিথ্যা নয়। কিন্তু লম্ফ না জ্বালালে তোমাকে ভাত বেড়ে দেব কী করে ? বাই আগের ভয় কাটিয়ে যুবকটিকে বলে। না মা, যুবকটি বাধা দিয়ে বলে, তোমার ভালোর জন্যই লম্ফ জ্বালাতে দিচ্ছি না, যদি পারো অন্ধকারেই হাঁড়ি থেকে যা আছে তুলে দাও দুমুঠো।

নিরুপায় মায়ে ঝিয়ে অনুমানে নিজের বাড়া ভাতের থালা থেকে একখানা এনে যুবকের হাতে দেয় । বাই বলে, দেখ বাবা আমরা কিন্তু ডোম চাঁড়াল মানুষ ।

বড়ো তৃপ্তির সঙ্গে ভাতের দলা মুখেদিয়ে যুবকটি বলে, মায়ের কোনো জাত থাকে? এসব পুরোনো চিন্তাধারা দূর করতেই আমরা নিজের মাকে ছেড়ে সব মাকে মাতৃজ্ঞান করছি ।

অন্ধকারে যুবকটির ভাত খাওয়ার শব্দ বাইয়ের বুকে বাজে, আদ্র হয় মন। বাই ভাবে কার জানি আদরের ধন, কার হাতে অন্ধকারে খাচ্ছে ভাত, দেশে এ – কোন অপদেবতার ভর হল যে পেটের ছেলেও নিজের মাকে মা ডাকতে পারে না। ছেলেটির ভাত খাওয়া শেষ হয়। বাসন্তী হাতে জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের হাতে দিতেই মা আঁধারের মধ্যে ঘটিটি যুবকের দিকে এগিয়ে দেয় । ঢকঢক করে জলপান করে সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মা, আজ তোমার ভাতের গরাসটি আমাকে শতায়ু করে দিল । যদি বেঁচে থাকি একদিন আলোকে আসব । এই বলে অন্ধকারেই বাই দেউর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ।

বিস্ময় বিমুড় হয়ে বাই শুধু মনে মনে বলে, বাবারে , তোকে মাধা গোঁসাই রক্ষা করুন ।

সেই রাতের কথা বলছি, যে – রাতে শিয়াল – কুকুরের তীক্ষ্ণ চিৎকার কণ্ঠিবাই আর বাসন্তীর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল । বাতাসের এক তীব্র আন্দোলনের মতো ঘটনাটি তাদের মনে এমন এক ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যেন সে – রাতেই লখেতরার পার ভাঙবে ।

তখনই গ্রামের অন্যদিক থেকে কেউ এক ঘরের চালার উপর উঠে চিৎকার করে জানায় , অজ্যাঠা মিলিটারি ... ওঠো ... ডিমুহু ওঠো... ।

হঠাৎ অন্ধকার আকাশকে নস্যাৎ করে ফুটে উঠেছিল অনেক গুলি, গুলির শব্দ।

ঠকঠক করে কাঁপছিল মাধা। সেই মুহূর্তে শিশুর ক্রন্দন, নারীপুরুষের আর্তচিৎকারে গ্রামখানি যেন সৃষ্টি ধ্বংসের কালরাত্রির মুখোমুখি ।

লখেতরার পাড় ভাঙার শব্দের থেকেও ভয়ানক। ঝড়ের গর্জনের থেকেও গগনভেদী সে – রাতেও আর্তনাদ ...।

কুঁড়েঘরের চালে টুপটাপ করে পড়তে থাকা বৃষ্টি – ফোঁটাগুলির মতো গ্রামবাসীর নিঃশব্দ রাতও একটু একটু করে শেষ হয় ।

কিন্তু কার জন্য এই ভোর? একজন যুবতি, একজন নারী, একজন মায়ের রূপেই তাঁকে তুমি মহিয়সী করো না কেন, বিশাল এই রাজনীতিশাস্ত্র বাসন্তীকে কোনরূপে বন্দিত করবে, গরিয়সী করবে ? সভ্যতার শত আঁচড়ে ধর্ষিতা বাসন্তীকে? সেই সকালে বাসন্তীকে চিতার আগুনে জ্বলে লখেতরার পারে। রাগ ক্ষোভ, জীবনের চিরবিচিত্র অশ্রুজ্বলে স্নান করে মাধব সেদিন হাতের বাঁশিটা লখেতরার জলে ছুঁড়ে ফেলে। ঢেউ –এর উপর উঠে বাঁশিটাও যেন সেদিন গেয়ে ওঠেঃ

স্নেহময়ী মা আমার, আমায় রেখো

জীবন দিয়ে পূজিব তোমায় সারাটা জীবন

স্নেহময় মাধা আমার, আমায় রেখো

কত স্বপ্ন বুকে আছে তোমার সঙ্গে

সেই গ্রামখানিতে রেখো আমায়

কন্যা করে বধূ করে ...

তখন সজল কবুতরটি দুঃখের করুণ সুরে ডাকে, কু কু কু কুউ- কু। লখেতরার অন্যপার থেকে কণ্ঠিবাই ডাক পাঠায় --- এই মাধা, বাবারে ফিরে আয়, সন্ধ্যা হল।

*****

সোনার দাঁত রূপোর দাঁত

সোনার দাঁত রূপোর দাঁত

অসমিয়াঃ বিপুল খাটনিয়ার

“হেই টাকলু, ঘুরে ঘুরে কোথায় যাচ্ছিস?”

হাতে একটা গ্যালন নিয়ে শইকিয়া ডাক্তারের পিওন রমেশ যাচ্ছিল, পোনাটি তার মুখের ভাব আর হাঁটার গতি দেখেই বুঝেছে- ব্যাটা ‘বরুয়া গ্যারেজ’ এর দিকেই যাচ্ছে। শুধু ডাক্তার শইকিয়াই নয় এই অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক মানুষই আসা যাওয়ার পথে বরুয়া গ্যারেজের সামনে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ কায়দায় হর্ন বাজায়।

না দেখার ভান করে সরে যাওয়ার তালে, রমেশ দেখা না দেখার মতো করে পোনটির দিকে মুখ তুলে তাকায় -হাতের ইঙ্গিতে সে বরুয়া গ্যারেজের কথাই বুঝিয়ে দেয়।

পোনটি তাকে আবার ডাকে, “কী? মাল লাগবে তো? আয় এদিকে আয়”

শইকিয়া ডাক্তার আর ভূঞা হাকিম দুজনেই গলায় গলায় বন্ধু। পোনটি ড্রাইভার আবার ভূঞা হাকিমের গাড়ি চালায়। মাঝে মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে সে পোনটির কাছ থেকে চোরাই তেল নিয়ে থাকে। পোনটি জোর করেই দেয়, সে ভয়ে ভয়ে নেয়। জানাজানি হলেই লঙ্কাকাণ্ড! তাই পারতপক্ষে রমেশ তাকে এড়িয়ে চলে।

রমেশ তার কাছে আসতেই পোনাটি ফিশফিশ করে শুধায়, “মাল চাই তো? কতখানি চাই? দশ লিটার! ঐ কশাইটা কত দিয়ে পাঠিয়েছে? একশ টাকা! ঠিক আছে, দশ টাকা তোর কমিশন।”

পোনটি শইকিয়া ডাক্তারের নাম দিয়েছে ‘কশাই’। গর্ভবতী এক মহিলার পেট চিরলেই নাকি নগদ চার পাঁচ হাজার টাকা। এদিকে ভূঞা হাকিমও কিসে কম? সামান্য একটা সই করলেই হাতের মুঠোয় হাজার বারোশ টাকা!

এসব লেনদেন করতে তাই পোনটিও দোষ ত্রুটির ভয় ডর করে না। মরাকে মারলেই না পাপ!

গ্যালনটা লুকিয়ে পাইপ লাগিয়ে সে ট্যাংকিতে টান দেয়। রমেশ শুধু ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে, কিজানি কেউ না এসে পড়ে।

পোনটি এই লাইনে পাকা। মাত্র এক বা দুই মিনিট। কাজ হাসিল।

পাইপ থেকে মুখে আসা পেট্রলের চুমুকটি থু দিয়ে ফেলে মুখখানি পরিষ্কার করে নেয় সে। শালা! কী বিচ্ছিরি গন্ধ! সে গজগজ করে, আগের মতো তেল আর নেই। আগে তেলের গন্ধই ছিল অন্যরকম! পেট্রোলের ধোঁয়ায়ও ছিল আপন আপন ভাব। কিজানি, কোন দেশ থেকে এখন আসে এসব তেল?

ট্যাংকির মুখ মুছে ভদ্রলোকের মতো সামনের সিটে হেলান দিয়ে বসে পোনটি ড্রাইভার। হাকিম স্যার এই অসময়ে এসে ঘরে ঢুকেছে যখন তখন বেশি হলে দশ পনের মিনিট। তেল বিক্রি করা টাকা কটা পকেট থেকে বের করে একবার নেড়ে চেড়ে দেখে। ---কী হবে এই কটা টাকায়? বাজার হাটে যা আগুণ! পথের ধুলোয় পড়া পেট্রোলের ফোঁটার মতো, পড়েই হাওয়া।

ঠাণ্ডা পড়েছে।

তার ছেলে মেয়ে কটা খালি পায়ে স্কুলে যায়। ছোটটার গায়ে বড়টার পুরনো সোয়েটার একটা আছে, বাকি দুটোর কিছুই নেই। সাদা পাতলা কাপড়ের পোশাক পরেই স্কুলে যায় ওরা। স্ত্রী প্রেমদা ওদের স্কুলের জন্য পাঠিয়েই তার চোখের দিকে তাকাবে। তার দৃষ্টিতে অভিযোগের চাহনি।

পোনটি তার এসব চাউনিকে একেবারে পাত্তা দেয় না। ---ঠান্ডা পড়েছে? আজকাল আর কোথায় আগের মতো শীত? বৃষ্টি হলে এক আধটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হয়---এছাড়া শীতের কোনও কোন চিহ্ন নেই কোথাও!

শীতের মধ্যে ধূলিবালির পথে টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে ওদের পা ফেটে চৌচির। ওরা ঘুমিয়ে পড়ার আগে বাড়ি ফিরলে পোনটি কখনও বা নিজেই কুসুম গরম জলে লবণ মিশিয়ে ওদের পা ধুইয়ে দেয়।

প্রেমদা মুখ ঝামটা দেয়, “রাখো রাখো। আর শুকনো আদর দেখাবার দরকার নেই। তাও যদি এক এক জোড়া হাওয়াই চটি এনে দিতে।”

“রবারের চটি কী চোখের জন্য ভাল নাকি?” সে চোখ পাকিয়ে বলে।

“সংসারের মানুষ তো পরছে।”

তাই।

হাকিমসাহেব বেরোচ্ছেন।

ছেঁড়া কাপড়টা দিয়ে এমনি একবার পিছনের সিটটা ঝেড়ে পোনটি গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

হাকিমের আজ মন মেজাজ বেশ ফুরফুরে।

গাড়িতে উঠেই হুকুম করেন, “চল রহদইপুকুর”

মাথা বাড়িয়ে পোনাটি হাকিমের মুখের দিকে তাকায়।

"স্যার, ডিউটিতে যাবেন বলেছিলেন?"

"কিসের ডিউটি ডিউটি করিস।" রাগের ভান করে হাকিম বলেন, "মানুষের ঘর সংসার থাকে না, নাকি? বল।"

রহদইপুকুরে হাকিমের শ্বশুর বাড়ি। হাকিম গিন্নির শরীর খারাপ, দুমাস হলো সেখানেই আছে। এখন সুযোগ পেলেই স্যার ওদিকে দৌড়য়। দৌড়ক, দৌড়বেই তো। কিন্তু তার কথাটাও আগে ভাগে কানে দিয়ে রাখতে হবে। তারও ঘর সংসার আছে। এদিকে রহদইপুকুরে এলেই হাকিম স্যারের কথার ঠিক থাকে না। এই আসছি বলে একদিন একরাত।

"আমার কিন্তু ফিরে যেতেই হবে স্যার"

"কেন তোর বউএরও শরীর খারাপ নাকি?"

"না স্যার। ছেলেমেয়ে কটার স্কুল খুলেছে। স্লেট পেন্সিল কিছুই কিনে দিতে পারি নি। ভেবেছিলাম আজ যাওয়ার সময় কিনে নিয়ে যাব। তার উপর এই কদিন নির্বাচনের ঘুরাঘুরি, গাড়ি পৌঁছতে পৌঁছুতেই রাত হয়ে যাচ্ছে।"

হাকিম চুপ করে থাকেন।

প্রেমদার রাগ হওয়ার এও এক কারণ।

বেচারি ভাত তরকারি রেঁধে বসে থাকে, সে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে একপ্রহর, ভাত তরকারি সব ঠাণ্ডা।

"চাকরি একা তুমিই কর।" প্রেমদা বলে।

"তুই কী বুঝবি? নির্বাচন আসছে, হাকিম দিনরাত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখানে একঘণ্টা ওখানে একঘণ্টা, কাছারিতে বসার সময় পায় না। আমি আর কী, ঢোলের সঙ্গে কাঠি।"

পোনাটি জানে প্রেমদাকে এসব বলে লাভ নেই। সে হল কূয়োর ব্যাঙ। কূয়োর উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখাটাই তার আকাশ, গ্রহতারা কত কী আছে কী করে বুঝবে!

জেলা শহর থেকে তার বাড়ি পাঁচ কিলোমিটার। গাড়ি জমা দিয়েই পোনাটি সাইকেলটা নেয়। বাজার টাজার না থাকলে আধঘণ্টার রাস্তা। আধঘণ্টায় কী সে কোনদিন বাড়ি যেতে পেরেছে? --- কেউ হয়তো একই কথা নিয়ে ঘেন ঘেন করবে, নাহয় সঙ্গ নেবে নদীর পারে পারে। ওদিকে গেলে তো আরও এক দেড় ঘণ্টা।

রহদইপুকুরে হাকিম আজ কিন্তু দেরি করে নি। তবু খেয়ে দেয়ে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে যায়। পোনাটি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়।

এখান থেকে বরআলির বেণু বিল পর্যন্ত রাস্তা খারাপ। মাঝে মাঝে একটাই ভয়, মস্ত মস্ত গর্ত। জোরে গিয়ে পড়লে তো হয়েই গেল। যদিও এই পথের প্রতিটি গর্ত তার পরিচিত। তারাও যেন তাকে আর তার গাড়িকে চিনে রেখেছে।

বরআলির বেনুবিল থেকে একটু এগিয়ে গেলেই থানা, থানার সামনে রাইফেলধারী সিপাহিরা দল বেঁধে থাকে, গাড়ি ঘোড়া থামিয়ে দেয়। গাড়ি বড় হলে থানায় চাঁদা দিলেই হয়, ছোটগাড়ির খানাতল্লাশি হয় যদি কোন উগ্রপন্থী কিংবা চোরা চালানের জিনিষপত্র থাকে।

পোনটি স্বাভাবিক গতিতে পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক পার হওয়ার সময়ই তিন তিনটে টর্চের আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তার চোখ ঝাপসা করে দেয়। কিছু খারাপ খারাপ গালমন্দও সে শোনে। ... তারপর কী হল সে জানে না।

জ্ঞান আসতে পোনটি হাসপাতালে।

তার কাপড় চোপড়ে শুধু রক্তের দাগ। হাত পা সবই কিন্তু অক্ষত। কোথাও কোন আহত হওয়ার চিহ্ন নেই। অনেক সময় নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখেও বুঝতে পারে না তার কী হয়েছে।

সকাল বেলা হাকিম স্যার এলেন। না, তারও কিছু হয়নি। গাড়িরও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কেবল আঘাত পেয়ে সে মুর্ছা যায় আর তার উপরের পাটির সামনের দাঁত তিনটে ভেঙে যায়।

হাকিম তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিশ ফিশিয়ে বলেন, "দুর্ঘটনার সময় তুই নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত ছিলি, বুঝলি।"

পোনাটি মাথা নাড়ে।

হাসপাতালে হাকিম তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেয় আর পনের দিনের বেতনসহ ছুটির অনুমতি।

বোকার মতো পোনাটি হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পোনাটিদের আগের বাড়ি ছিল বনগাঁও এ।

বাড়ির পাশেই বনগাঁও এর মৌজাদারের বাড়ি।

ধনী মৌজাদার প্রতাপী, কিন্তু দয়াধর্ম পরায়ণ। বনগাঁও এর মানুষ বিবাহ আদি অনুষ্ঠানে বাঁশ, পুরনো সুপুরি গাছ লাগলে তার কাছে পায়। দুরবস্থাগ্রস্থ জ্ঞাতিদের ধান চাল কিংবা সাধ্যমতো টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন।

যুবা বয়সে একবার হাতির পিঠ থেকে পড়ে এই ধনী মৌজাদার মানুষটির সামনের পাটির দুটি দাঁত ভেঙে যায়। --- ধনী মৌজাদারও সৌখীন মানুষ। ভাঙা দাঁত নিয়ে কিছুদিন বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাকে তখনই একজন পরামর্শ দেয়, মৌজাদার সদরে যায়। দুদিন পর ঘুরেও আসে। কোথাকার ভাঙা দাঁত কোথায় গেল। মৌজাদার মুখ খুললেই মানুষের চোখে পড়ে---চকচকে দুটো সোনার দাঁত।

পোনটিরা যুবা বয়সের ধনী মৌজাদারকে দেখেনি, দেখেছিল কিছুটা বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু দাঁত দুটো আগের মতোই জ্বলজ্বল করছিল।

হাসপাতালে টাকার বাণ্ডিলটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এত বছর পর পোনটি প্রায় ভুলে যাওয়া এই ধনী মৌজাদারের মুখখানা মনে করার চেষ্টা করে।

কিন্তু তার হাজার চেষ্টাও বিফলে যায়। মৌজাদারের মুখখানা তার সামনে আসে না, তার বন্ধ চোখের সামনে কেবল ভেসে ওঠে— জ্বলজ্বল করা দুটো খাঁটি সোনার দাঁত।

পনের দিনের ছুটি কাটিয়ে ষোল দিনের দিন পোনাটি এসে ভূঞা হাকিমের বাড়িতে হাজির হয়।

হাকিম গিন্নির বাচ্চা হয়েছে। হাকিমের মনে আনন্দ।

মুখ খুলতেই পোনাটির সামনের পাটির দাঁতের প্রায় দেড় ইঞ্চির ফাঁকটা হাকিমের চোখে পড়ে।

" দাঁত লাগাস নি ?"

"দাঁত দুটো আর কী কথা স্যার। চুলেও পাক ধরেছে একটা দুটো দাঁতও পড়বে এমনি।"

"পাঁচ হাজার টাকা! তুই তো বলেছিলি দাঁত লাগাবি?" ভূঞা হাকিম চোখ বড় বড় করে তাকায়।

"এই কটা টাকা আবার টাকা নাকি স্যার। ছেলেমেয়েদের দামি দেখে এক এক জোড়া জুতো কিনে দিলাম। ভাল দেখে জ্যাকেট কিনলাম তিনটা---ঘরের মানুষটিও আমার তেমনি। বিয়ের সময় শুধু মানুষ সাক্ষী করে ঘরে তুলেছিলাম, কুটা একটাও দিই নি। ভাবলাম, এতদিনে যখন একটা উপায় পেয়েছি, তাকে একপ্রস্ত পাটের কাপড় কিনে দিই।"

"দিলি"

"কোথায় আর দিলাম স্যার। শুনেই নাকের জলে চোখের জলে একাকার। একবার আমার ফোলা মুখের দিকে তাকায়--- আর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাদে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী স্যার। ঘরটাও ফুটো, জলপড়ে, এক বাণ্ডিল টিন কিনলাম পাঁচ হাজার টাকার, শেষ।"

পোনাটির ফোকলা মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

*****

smazumdar07@gmail.com